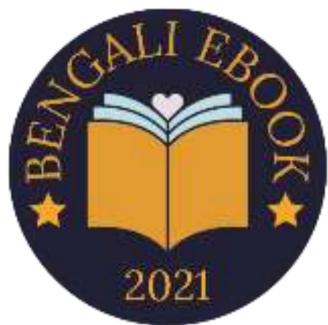
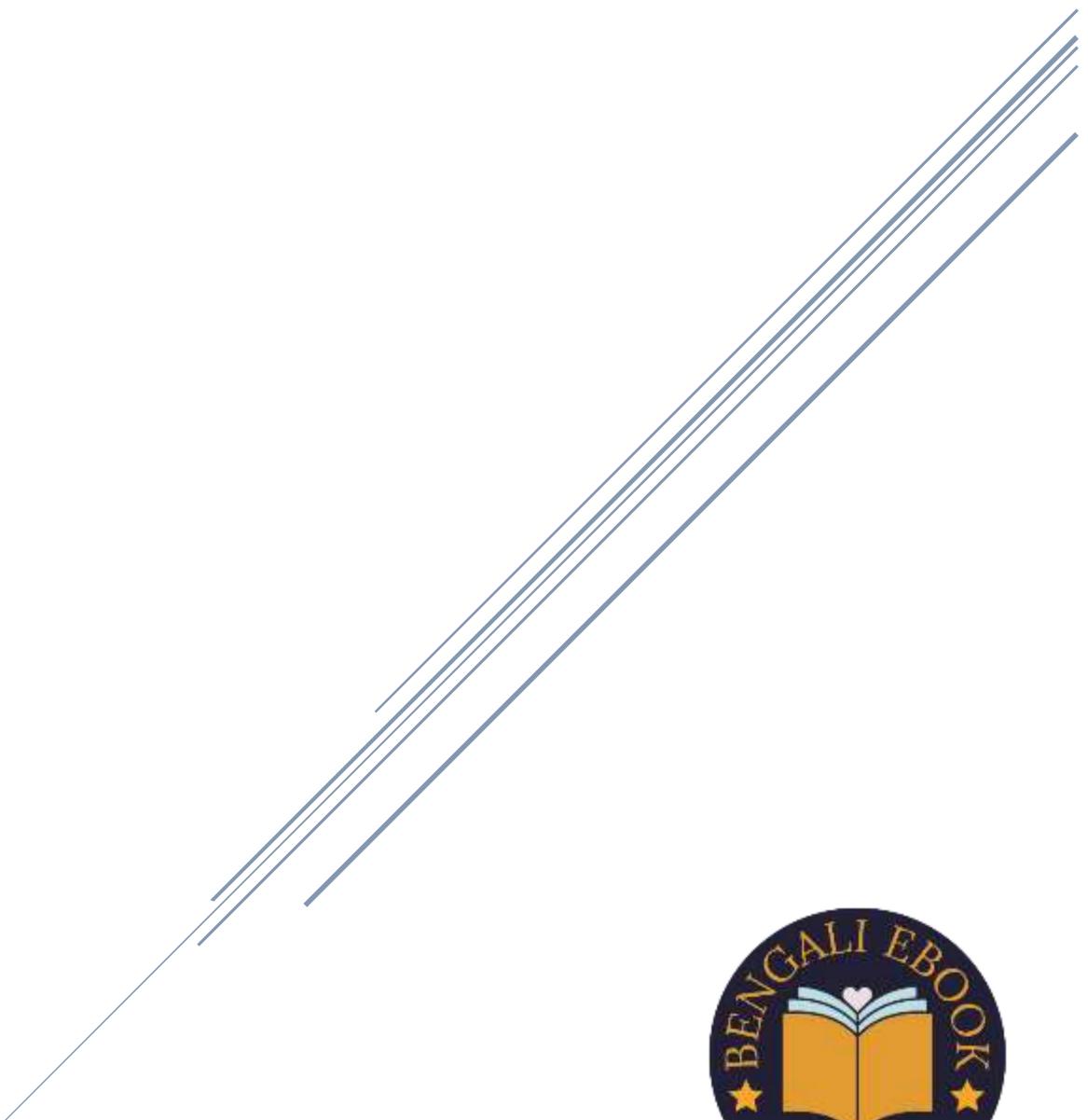


ছাড়পত্র

সুকান্ত ভট্টাচার্য



সূচিপত্র

| | |
|--------------------|----|
| অনুভব | 3 |
| আগামী | 4 |
| আগ্নেয়গিরি | 5 |
| আঠারো বছর বয়স | 7 |
| ইউরোপের উদ্দেশ্যে | 9 |
| এই নবান্নে | 10 |
| একটি মোরগের কাহিনী | 11 |
| ঐতিহাসিক | 13 |
| কণ্ঠয় | 15 |
| কলম | 16 |
| কাশীর | 18 |
| কৃষকের গান | 20 |
| খবর | 21 |
| চট্টগ্রাম: ১৯৪৩ | 23 |
| চারাগাছ | 25 |
| চিল | 27 |
| ছাড়পত্র | 28 |
| ঠিকানা | 29 |
| ডাক | 31 |
| দুরাশার মৃত্যু | 32 |
| দেশলাই কাঠি | 33 |
| প্রস্তুত | 35 |
| প্রার্থী | 36 |
| ফসলের ডাক ১৩৫১ | 38 |
| বিবৃতি | 40 |
| বেধন | 42 |
| মজুরদের ঝড় | 46 |
| মধ্যবিত্ত '৪২ | 48 |
| মৃত্যুজয়ী গান | 49 |

ছাড়পত্র

| | |
|--------------------------|----|
| রবীন্দ্রনাথের প্রতি..... | 50 |
| রানার..... | 51 |
| লেনিন | 53 |
| শত্রু এক..... | 55 |
| সিঁড়ি..... | 56 |
| সিগারেট | 57 |
| সেপ্টেম্বর '৪৬..... | 59 |
| হে মহাজীবন..... | 62 |

অনুভব

১৯৪০

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুঞ্চ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন।
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রেত্ব দিন দিন;
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন নেইকো কারো।
অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।
হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—‘রক্ত খরচ’ তাতে।
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম!

১৯৪৬

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখে নি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাদ্যতার টেউ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ? শুনছ উদাম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট;
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।
প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত,
দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত;
তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি,
তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।
তাহিতো চলেছি দিন-পঞ্জিকা লিখে—
বিদ্রোহ আজ! বিল্লব চারিদিকে॥

আগামী

জড় নই, মৃত নই, নই অঙ্ককারের খনিজ,
 আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
 মাটিতে লালিত ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
 মেলেছি সন্দিপ্ত চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
 যদিও নগণ্য আমি, তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
 তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মরধ্বনি বাজে,
 বিদীর্ণ করেছি মাটি, দেখেছি আলোর আনাগোনা
 শিকড়ে আমার তাই অরণ্যের বিশাল চেতনা।
 আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
 উদাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা;
 তার পর দৃপ্ত শাখা মেলে দেব সবার সম্মুখে,
 ফোটাব বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।

সংহত কঠিন ঝড়ে দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়;
 শাখায় শাখায় বাঁধা, প্রত্যাহত হবে জানি ঝড়;
 অঙ্কুরিত বন্ধু যত মাথা তুলে আমারই আহ্নানে
 জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
 আগামী বসন্তে জেনো মিশে যাব বৃহত্তের দলে;
 জয়ধ্বনি কিশলয়ে; সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
 ক্ষুদ্র আমি তুচ্ছ নই- জানি আমি ভাবী বনস্পতি,
 বৃষ্টির, মাটির রসে পাই আমি তারি তো সম্মতি।
 সেদিন ছায়ায় এসো; হানো যদি কঠিন কুঠারে
 তবুও তোমায় আমি হাতছানি দেব বারে বারে;
 ফল দেব, ফুল দেব, দেব আমি পাখিরও কৃজন
 একই মাটিতে পুষ্ট তোমাদের আপনার জন।।

আমেয়গিরি

কখনো হঠাত মনে হয়ঃ
আমি এক আমেয় পাহাড়।
শান্তির ছায়া-নিবিড় গুহায় নিদ্রিত সিংহের মতো
চোখে আমার বহু দিনের তন্দ্রা।
এক বিস্ফোরণ থেকে আর এক বিস্ফোরণের মাঝখানে
আমাকে তোমরা বিদ্রূপে বিদ্র করেছ বারংবার
আমি পাথরঃ আমি তা সহ্য করেছি।

মুখে আমার মৃদু হাসি,
বুকে আমার পুঞ্জীভূত ফুটন্ত লাভা।
সিংহের মতো আধ-বোজা চোখে আমি কেবলি দেখছিঃ
মিথ্যার ভিতে কল্পনার মশলায় গড়া তোমাদের শহর,
আমাকে ঘিরে রচিত উৎসবের নির্বোধ অমরাবতী,
বিদ্রূপের হাসি আর বিদ্বেষের আতস-বাজি—
তোমাদের নগরে মদমত্ত পূর্ণিমা।

দেখ, দেখঃ
ছয়াঘন, অরণ্য-নিবিড় আমাকে দেখঃ
দেখ আমার নিরঞ্জিনী বন্যতা।
তোমাদের শহর আমাকে বিদ্রূপ করুক,
কুঠারে কুঠারে আমার ধৈর্যকে করুক আহত,
কিছুতেই বিশ্বাস ক'রো না—
আমি ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার সহোদর।
তোমাদের কাছে অজ্ঞাত থাক
ভেতরে ভেতরে মোচড় দিয়ে ওঠা আমার অগ্ন্যদ্গার,
অরণ্যে ঢাকা অন্তর্নিহিত উত্তোপের জ্বালা।

তোমার আকাশে ফ্যাকাশে প্রেত আলো,
বুনো পাহাড়ে মৃদু-ধোঁয়ার অবগুঞ্ছনঃ
ও কিছু নয়, হয়তো নতুন এক মেঘদৃত।

উৎসব কর, উৎসব কর—
ভুলে যাও পেছনে আছে এক আগ্নেয় পাহাড়,
ভিসুভিয়স-ফুজিয়ামার জাগ্রত বংশধর।
আর,
আমার দিন-পি কায় আসন হোক
বিস্ফোরণের চরম, পবিত্র তিথি॥

আঠারো বছর বয়স

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙ্গতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়—
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।

এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য
বাপ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে,
প্রাণ দেওয়া-নেওয়া ঝুলিটা থাকে না শূন্য
সঁপে আঘাকে শপথের কোলাহলে।

আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্ঘাগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

আঠারো বছর বয়সে আঘাত আসে
অবিশ্রান্ত; একে একে হয় জড়ো,
এ বয়স কালো লক্ষ দীর্ঘশ্বাসে
এ বয়স কাঁপে বেদনায় থরোথরো।

তব আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি,

এ বয়স বাঁচে দুর্ঘোগে আর ঝড়ে,
বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী
এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে।

এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে,
এ বয়সে তাই নেই কোনো সংশয়—
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে॥

ইউরোপের উদ্দেশে

ওখানে এখন মে-মাস তুষার-গলানো দিন,
 এখানে অগ্নি-ঝরা বৈশাখ নির্দাইন;
 হয়তো ওখানে শুরু মন্ত্র দক্ষিণ হাওয়া;
 এখানে বোশেখী ঝড়ের ঝাপটা পশ্চাং দাওয়া;
 এখানে সেখানে ফুল ফোটে আজ তোমাদের দেশে
 কত রঙ, কত বিচ্চি নিশি দেখা দেয় এসে।
 ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে কত ছেলেমেয়ে
 এই বসন্তে কত উৎসব কত গান গেয়ে।
 এখানে তো ফুল শুকনো, ধূসর রঙের ধূলোয়
 খাঁ-খাঁ করে সারা দেশটা, শান্তি গিয়েছে চুলোয়।
 কঠিন রোদের ভয়ে ছেলেমেয়ে বন্ধ ঘরে,
 সব চুপচাপ; জাগবে হয়তো বোশেখী ঝড়ে।
 অনেক খাটুনি, অনেক লড়াই করার শেষে
 চারিদিকে ক্রমে ফুলের বাগান তোমাদের দেশে;
 এদেশে যুদ্ধ মহামারী, ভুখা জ্বলে হাড়ে-
 অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মের মাঠে তাই ঘূম কাড়ে
 বেপরোয়া প্রাণ; জমে দিকে দিকে আজ লাখে লাখে-
 তোমাদের দেশে মে-মাস; এখানে ঝোড়ো বৈশাখ।।

এই নবান্নে

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—
পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শশান।
তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায়ঃ
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায়;
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই, ছেড়ে গেছে বোন,
পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন;
নিজের হাতের জমি ধান-বোনা,
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসেনি শুভক্ষণ—
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।

এবার নতুন জোরালো বাতাসে
জয়ঘাত্রার ধ্বনি ভেসে আসে,
পিছে মৃত্যুর ক্ষতির নির্বাচন—
এই হেমন্তে ফসলেরা বলেঃ কোথায় আপন জন?
তারা কি কেবল লুকোনো থাকবে,
অক্ষমতার গ্লানিকে ঢাকবে,
প্রাণের বদলে যারা প্রতিবাদ করছে উচ্চারণ
এই নবান্নে প্রতারিতদের হবে না নিমন্ত্রণ?

একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছেট্ট এক কোণে,
ভাঙ্গা প্যাকিং বাস্ত্রের গাদায়—
আরো দু'তিনটি মুরগীর সঙ্গে।
আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চিংকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটাল সেই মোরগ
ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানাল না সেই বিরাট শক্ত ইমারত।

তারপর শুরু হল তাঁর আঁস্তাকুড়ে আনাগোনা;
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার!

তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এল অংশীদার—
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতার মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

খাবার! খাবার! খানিকটা খাবার!
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বার বার চেষ্টা ক'রল প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছেট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
'প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবার'!

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধ্বনিবে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে ;
অবশ্য খাবার খেতে নয়—

ছাড়পত্র

খবার হিসেবে

ঐতিহাসিক

আজ এসেছি তোমাদের ঘরে ঘরে—
পৃথিবীর আদালতের পরোয়ানা নিয়ে
তোমরা কি দেবে আমার প্রশ্নের কৈফিয়ৎ:
কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল?
আজ বাহান সালের সূচনায় কি তার উত্তর দেবে?
জানি! স্তন্ধ হয়ে গেছে তোমাদের অগ্রগতির স্নোত,
তাই দীর্ঘশ্বাসের ধোঁয়ায় কালো করছ ভবিষ্যৎ
আর অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কঘলা।
কিন্তু ভেবে দেখেছ কি?
দেরি হয়ে গেছে অনেক, অনেক দেরি!
লাইনে দাঁড়ানো অভ্যেস কর নি কোনোদিন,
একটি মাত্র লক্ষ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
মারামারি করেছ পরম্পর,
তোমাদের ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা দেখে
বন্ধ হয়ে গেছে মুক্তির দোকানের ঝাঁপ।
কেবল বঞ্চিত বিহুল বিমৃঢ় জিজ্ঞাসাভরা চোখে
প্রত্যেকে চেয়েছ প্রত্যেকের দিকেঃ
—কেন এমন হল?

একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুদার মাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কঘলা, কেরোসিন?
এ সব দুপ্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চাল্লিশ কোটির দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।

মূর্খ তোমরা
লাইন দিলেং কিন্তু মুক্তির বদলে কিনলে মৃত্যু,
রক্তয়ের বদলে পেলে প্রবঞ্চনা।
ইতিমধ্যে তোমাদের বিবদমান বিশৃঙ্খল ভিড়ে
মুক্তি উঁকি দিয়ে গেছে বহুবার।
লাইনে দাঁড়ানো আয়ত্ত করেছে ঘারা,
সোভিয়েট, পোল্যান্ড, ফ্রান্স
রক্তমূল্যে তারা কিনে নিয়ে গেল তাদের মুক্তি
সর্ব প্রথম এই পৃথিবীর দোকান থেকে।
এখনো এই লাইনে অনেকে প্রতীক্ষমান,
প্রার্থী অনেক; কিন্তু পরিমিত মুক্তি।
হয়তো এই বিশ্বব্যাপী লাইনের শেষে
এখনো তোমাদের স্থান হতে পারে—
এ কথা ঘোষণা ক'রে দাও তোমাদের দেশময়
প্রতিবেশীর কচে।
তারপর নিঃশব্দে দাঁড়াও এ লাইনে প্রতিজ্ঞা
আর প্রতীক্ষা নিয়ে
হাতের মুঠোয় তৈরী রেখে প্রত্যেকের প্রাণ।
আমি ইতিহাস, আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো,
মনে রেখো, দেরি হয়ে গেছে, অনেক অনেক দেরি।
আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরঝবনিতে আছে আনন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।।

কনভয়

হঠাত ধূলো উড়িয়ে ছুটে গেল
যুদ্ধফেরত এক কনভয়ঃ
ক্ষেপে-ওঠা পঙ্গপালের মতো
রাজপথ সচকিত ক'রে
আগে আগে কামান উঁচিয়ে,
পেছনে নিয়ে খাদ্য আর রসদের সন্তার।

ইতিহাসের ছাত্র আমি,
জানালা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম
ইতিহাসের দিকে।
সেখানেও দেখি উন্মত্ত এক কনভয়
ছুটে আসছে যুগযুগান্তের রাজপথ বেয়ে।
সামনে ধূম-উদ্গীরণরত কামান,
পেছনে খাদ্যশস্য অঁকড়ে-ধরা জনতা—
কামানের ধোঁয়ার আড়ালে আড়ালে দেখলাম,
মানুষ।
আর দেখলাম ফসলের প্রতি তাদের পুরুষানুক্রমিক
মমতা।
অনেক যুগ, অনেক অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র পেরিয়ে
তারা এগিয়ে আসছে; ঝল্সানো কঠোর মুখে।।

কলম

কলম, তুমি কত না যুগ কত না কাল ধ'রে
অক্ষরে অক্ষরে
গিয়েছ শুধু ক্লান্তিহীন কাহিনী শুরু ক'রে।
কলম, তুমি কাহিনী লেখো, তোমার কাহিনী কি
দুঃখে জ্বলে তলোয়ারের মতন ঝিকিমিকি?

কলম, তুমি শুধু বারংবার,
আনত ক'রে ক্লান্ত ঘাড়
গিয়েছ লিখে স্বপ্ন আর পুরনো কত কথা,
সাহিত্যের দাসত্বের ক্ষুদিত বশ্যতা।
ভগ্ন নিব, রুগ্ন দেহ, জলের মতো কালি,
কলম, তুমি নিরপরাদ তরুও গালাগালি
খেয়েছ আর সয়েছ কত লেখকদের ঘৃণা,
কলম, তুমি চেষ্টা কর, দাঁড়াতে পার কি না।

হে কলম! তুমি ইতিহাস গিয়েছ লিখে
লিখে লিখে শুধু ছড়িয়ে দিয়েছ চতুর্দিকে।
তবু ইতিহাস মূল্য দেবে না, এতটুকু কোন
দেবে না তোমায়, জেনো ইতিহাস বড়ই কৃপণ;
কত লাঞ্ছনা, খাটুনি গিয়েছে লেখকের হাতে
ঘুমহীন চোখে অবিশ্রান্ত অজস্র রাতে।
তোমার গোপন অশ্রু তাইতো ফসল ফলায়
বহু সাহিত্য বহু কাব্যের বুকের তলায়।
তবু দেখ বোধ নেই লেখকের কৃতজ্ঞতা,
কেন চলবে এ প্রভুর খেয়ালে, লিখবে কথা?

হে কলম! হে লেখনী! আর কত দিন
ঘর্ষণে ঘর্ষণে হবে ক্ষীণ?
আর কত মৌন-মূক, শব্দহীন দ্বিধান্বিত বুকে
কালির কলঙ্ক চিহ্ন রেখে দেবে মুখে?

আর কত আর
কাটবে দুঃসহ দিন দুর্বার লজ্জার?
এই দাসত্ব ঘুচে যাক, এ কলঙ্ক মুছে যাক আজ,
কাজ কর- কাজ।

মজুর দেখ নি তুমি? হে কলম, দেখ নি বেকার?
বিদ্রোহ দেখ নি তুমি? রক্তে কিছু পাও নি শেখার?
কত না শতাব্দী, যুগ থেকে তুমি আজো আছ দাস,
প্রত্যেক লেখায় শুনি কেবল তোমার দীর্ঘশ্বাস!
দিন নেই, রাত্রি নেই, শ্রান্তিহীন, নেই কোনো ছুটি,
একটু অবাধ্য হলে তখুনি ভূকুটি;
এমনি করেই কাটে দুর্ভাগা তোমার বারো মাস,
কয়েকটি পয়সায় কেনা, হে কলম, তুমি ক্রীতদাস।
তাই যত লেখ, তত পরিশ্রম এসে হয় জড়োঃ
-কলম! বিদ্রোহ আজ! দল বেঁধে ধর্মঘট করো।
লেখক স্তুতি হোক, কেরানীরা ছেড়ে দিক হাঁফ,
মহাজনী বন্ধ হোক, বন্ধ হোক মজুরের পাপ;
উদ্বেগ-আকুল হোক প্রিয়া যত দূর দূর দেশে,
কলম! বিদ্রোহ আজ, ধর্মঘট, হোক অবশেষে;
আর কালো কালি নয়, রক্তে আজ ইতিহাস লিখে
দেওয়ালে দেওয়ালে এঁটে, হে কলম,
আনো দিকে দিকে।।

কাশ্মীর

সেই বিশ্রী দম-আটকানো কুয়াশা আর নেই
 নেই সেই একটানা তুষার-বৃষ্টি,
 হঠাৎ জেগে উঠেছে—
 সূর্যের ছোঁয়ায় চমকে উঠেছে ভুঞ্বর্গ।
 দুহাতে তুষারের পর্দা সরিয়ে ফেলে
 মুঠো মুঠো হলদে পাতাকে দিয়েছে উড়িয়ে,
 দেকেছে রৌদ্রকে,
 দেকেছে তুষার-উড়িয়ে-নেওয়া বৈশাখী ঝড়কে,
 পৃথিবীর নন্দন-কানন কাশ্মীর।

কাশ্মীরের সুন্দর মুখ কঠোর হল
 প্রচণ্ড সূর্যের উত্তাপে।
 গলে গলে পড়ে বরফ—
 ঝরে ঝরে পড়ে জীবনের স্পন্দনঃ
 শ্যামল আর সমতল মাটির
 স্পর্শ লেগেছে ওর মুখে,
 দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ে ওর চুলঃ
 আন্দোলিত শাল, পাইন আর দেবদারুর বনে
 ঝড়ের পক্ষে আজ সুস্পষ্ট সম্মতি।
 কাশ্মীর আজ আর জমাট-বাঁধা বরফ নয়ঃ
 সূর্য-করোত্তাপে জাগা কঠোর গ্রীষ্মে
 হাজার হাজার চঞ্চল স্নোত।

তাই আজ কাল-বৈশাখীর পতাকা উড়েছে
 ক্ষুঞ্চ কাশ্মীরের উদ্দাম হাওয়ায় হাওয়ায়;
 দুলে দুলে উঠেছে
 লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঘুমন্ত, নিষ্ঠব্ধ
 বিরাট ব্যাপ্তি হিমালয়ের বুক।।

দম-আটকানো কুয়াশা তো আর নেই
নেই আর সেই বিশ্রী তুষার-বৃষ্টি,
সূর্য ছুঁয়েছে ‘ভূস্বর্গ চঞ্চল’
সহসা জেগেই চমকে উঠেছে দৃষ্টি।

দুহাতে তুষার-পর্দা সরিয়ে ফেলে
হঠাতে হলদে পাতাকে দিয়েছে উড়িয়ে
রোদকে ডেকেছে নন্দনবন পৃথিবীর
বৈশাখী ঝড় দিয়েছে বরফ গুঁড়িয়ে।

সুন্দর মুখ কঠোর করেছে কাশ্মীর
তীক্ষ্ণ চাহনি সূর্যের উত্তাপে,
গলিত বরফে জীবনের স্পন্দন
শ্যামল মাটির স্পর্শে ও আজ কাঁপে।

সাগর-বাতাসে উড়েছে আজ ওর চুল
শাল দেবদারু পাইনের বনে ক্ষেত্রে,
ঝড়ের পক্ষে চূড়ান্ত সম্মতি—
কাশ্মীর নয়, জমাট বাঁধা বরফ।

কঠোর গ্রীষ্মে সুর্যোত্তাপে জাগা—
কাশ্মীর আজ চঞ্চল-স্ন্যোত লক্ষঃ
দিগ্দিগন্তে ছুটে ছুটে চলে দুর্বার
দুঃসহ ক্রোধে ফুলে ওঠে বক্ষ।

ক্ষুঞ্চ হাওয়ায় উদ্দাম উঁচু কাশ্মীর
কালবোশেখীর পতাকা উড়েছে নভে,
দুলে দুলে ওঠে ঘুমন্ত হিমালয়
বহু যুগ পরে বুঝি জাগ্রত হবে।।

কৃষকের গান

এ বন্ধ্য মাটির বুক চিরে
এইবার ফলাব ফসল—
আমার এ বলিষ্ঠ বাহুতে
আজ তার নির্জন বোধন।
এ মাটির গর্ভে আজ আমি
দেখেছি আসন্ন জন্মেরা
ক্রমশ সুপুষ্ট ইঙ্গিতেঃ
দুর্ভিলে অন্তিম কবর।
আমার প্রতিজ্ঞা শুনেছ কি?
(গোপন একান্ত এক পণ)
এ মাটিতে জন্ম দেব আমি
অগণিত পল্টন-ফসল।
ঘনায় ভাঙ্গন দুই চোখে
ধ্বংসস্ত্রোত জনতা জীবনে;
আমার প্রতিজ্ঞা গ'ড়ে তোলে
ক্ষুদিত সহস্র হাতছানি।
দুয়ারে শত্রুর হানা
মুঠিতে আমার দুঃসাহস।
কর্ষিত মাটির পথে পথে
নতুন সভ্যতা গড়ে পথ।।

খবর

খবর আসে!

দিগ্দিগন্ত থেকে বিদ্যুদ্বাহিনী খবর;

যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ঘড়

—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।

রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝঞ্জুকৃত ছন্দে- প্রকাশের ব্যগ্রতায়;

তোমাদের জীবনে যখন নির্দ্বাভিভুত মধ্যরাত্রি

চোখে স্বপ্ন আর ঘরে অন্ধকার।

অতল অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে;

অভস্ত হাতে খবর সাজাই-

ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,

দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।

কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে ;

বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।

তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে

খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে,

তাদের পেয়ে কখনো কঢ়ে নামে ব্যথা, কখনো বা আসে গান ;

সকালে দিনের আলোয় যখন তোমাদের কাছে তারা পৌঁছোয়

তখন আমাদের চোখে তাদের ডানা ঝরে গেছে।

তোমরা খবর পাও,

শুধু খবর রাখো না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের।

ঐ কম্পোজিটর কি কখনো চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতার কোনো ফাঁকে?

পুরনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী

৯ই আগস্টে কি আসাম সীমান্ত আক্রমণে?

জ্বলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজীর মুক্তিতে,

প্যারিসের অভ্যুত্থানে?

দুঃসংবাদকে মনে হয় না কি

কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা?

যে খবর প্রাণের পক্ষপাতিত্বে অভিষ্ঠিক্ত
আত্মপ্রকাশ করে নাকি বড় হরফের সম্মানে?
এ প্রশ্ন অব্যক্ত অনুচ্ছারিত থাকে
ভোরবেলাকার কাগজের পরিচ্ছন্ন ভাঁজে ভাঁজে।

শুধু আমরা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি!

তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের-
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা দানের গুচ্ছকে?
কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই
মদ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্ত্র অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরীরা এসেছে আমাদের
চেতনার পথ বেয়ে।

আমার হৃদ্যন্তে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথা-
পৃথিবী মুক্ত- জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে স্বপ্ন।
কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায়।

আজ তোমরা এখনো ঘুমে॥

চট্টগ্রামঃ ১৯৪৩

ক্ষুদর্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম—
 চট্টগ্রামঃ বীর চট্টগ্রাম!
 বিক্ষিত বিধবস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
 আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
 বিদ্যুৎপ্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন।
 চট্টগ্রামঃ বীর চট্টগ্রাম!
 এখনো নিষ্ঠক্ষ তুমি
 তাই আজো পাশবিকতার
 দুঃসহ মহড়া চলে,
 তাই আজো শত্রুরা সাহসী।
 জানি আমি তোমার হৃদয়ে
 অজস্র ঔদার্ঘ আছে; জানি আছে সুস্থ শালীনতা
 জানি তুমি আঘাতে আঘাতে
 এখনও স্থিমিত নও, জানি তুমি এখনো উদ্দাম—
 হে চট্টগ্রাম!
 তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে
 সহস্র কাজের ফাঁকে মনে পড়ে শার্দূলের ঘুম
 অরণ্যের স্বপ্ন চোখে, দাঁতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর।
 হে অভুক্ত ক্ষুদিত শ্বাপদ—
 তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবন্ধ প্রতিটি নখর
 এখনো হয় নি নিরাপদ।
 দিগন্তে দিগন্তে তাই ধৰনিত গর্জন
 তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
 যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ।
 তোমার সংকল্পস্ত্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
 এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
 তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম!
 আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।।

চারাগাছ

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি;
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে;
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায়;
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি-
এ অট্টালিকার প্রতি হাঁটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের, রক্তের আর চেখের জলের।
তবু এই প্রাসাদকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে
সেলাম জানায় লোকে, চেয়ে থাকে বিমৃঢ় বিশ্বয়ে।
আমি তাই এ প্রাসাদে এতকাল ঐশ্বর্য দেখেছি,
দেখেছি উদ্বৃত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা।

হঠাতে সেদিন
চকিত বিশ্বয়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্ণিশের দারে
অশ্঵গুণ গাছের চারা।

অমনি পৃথিবী
আমার চেখের আর মনের পর্দায়
আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিল একটি পলকে।

ছোট ছোট চারাগাছ-
রসহীন খাদ্যহীন কার্ণিশের দারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছাসে।

হঠাতে চকিতে,
এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরূহ

শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল
উদ্বৃত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে।

ছোট ছোট চারাগাছ-
নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনেঃ
প্রত্যেক ইঁটের নীচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের।

তাইতো অবাক আমি দেখি যত অশ্঵শ্চারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ ;
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।

মনে হয়, এই সব অশ্঵শ্চ-শিশুর
রক্তের, ঘামের আর চোখের জলের
দারায় দারায় জন্ম,
ওরা তাই বিদ্রোহের দৃত।।

চিল

পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলামঃ
ফুটপাতে এক মরা চিল!

চমকে উঠলাম ওর করণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে
লুঞ্ছনের অবাধ উপনিবেশ;
যার শ্যেন দৃষ্টিতে কেবল চিল
তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্য প্রবৃত্তি—
তাকে দেখলাম, ফুটপাতে মুখ গুঁজে প'ড়ে।
গম্ভুজশিখরে বাস করত এই চিল,
নিজেকে জাহির করত সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে;
হলকা হাওয়ায় ডানা মেলে দিত আকাশের নীলে—
অনেককে ছাড়িয়েঃ এককঃ
পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে।

অনেকে আজ নিরাপদঃ
নিরাপদ ইঁদুর ছানারা আর খাদ্য-হাতে ত্রস্ত পথচারী,
নিরাপদ-কারণ আজ সে মৃত।
আজ আর কেউ নেই ছোঁ মারার,
ওরই ফেলে-দেওয়া উচ্ছিষ্টের মতো
ও পড়ে রইল ফুটপাতে,
শুক্রনো-শীতল, বিকৃত দেহে।

হাতে যাদের ছিল প্রাণধারণের খাদ্য
বুকের কাছে সঘন্ত্বে চেপে ধরা—
তারা আজ এগিয়ে গেল নির্ভয়ে;
নিষ্ঠুর বিদ্বৃপ্তের মতো পিছনে ফেলে
আকাশচুয়ত এক উদ্বৃত চিলকে।।

ছাড়পত্র

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আজ রাত্রে
 তার মুখে খবর পেলুমঃ
 সে পেয়েছে ছাড়পত্র এক,
 নতুন বিশ্বের দ্বারে তাই ব্যক্ত করে অধিকার
 জন্মমাত্র সুতীর্ণ চিৎকারে।
 খর্বদেহ নিঃসহায়, তবু তার মুষ্টিবন্ধ হাত
 উত্তোলিত, উদ্ভাসিত
 কী এক দুর্বোধ্য প্রতিজ্ঞায়।
 সে ভাষা বোঝে না কেউ,
 কেউ হাসে, কেউ করে মৃদু তিরঙ্গার।
 আমি কিন্তু মনে মনে বুঝেছি সে ভাষা।
 পেয়েছি নতুন চিঠি আসন্ন যুগের
 পরিচয়-পত্র পড়ি ভূমিষ্ঠ শিশুর
 অস্পষ্ট কুয়াশাভরা চোখে।
 এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
 জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধৰ্মসন্তুপ-পিঠে
 চলে যেতে হবে আমাদের।
 চলে যাব- তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
 প্রাণপনে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
 এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
 নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।
 অবশেষে সব কাজ সেরে
 আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
 করে যাব আশীর্বাদ,
 তারপর হব ইতিহাস।।

ঠিকানা

ঠিকানা আমার চেয়েছ বন্ধু—
ঠিকানার সন্ধান,
আজও পাও নি? দুঃখ যে দিলে করব না অভিমান?
ঠিকানা না হয় না নিলে বন্ধু,
পথে পথে বাস করি,
কখনো গাছের তলাতে
কখনো পর্ণকুটির গড়ি।
আমি যায়াবর, কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘূরি।
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাই নাকো পথ,
তাইতো পথের নুড়িতে গড়ব
মজবুত ইমারত।

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে,
আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
সূর্যোদয়ের পথে।
ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া,
রুশ ও চীনের কাছে,
আমার ঠিকানা বহুকাল ধ'রে
জেনো গচ্ছিত আছে।
আমাকে কি তুমি খুঁজেছ কখনো
সমস্ত দেশ জুড়ে?
তবুও পাও নি? তাহলে ফিরেছ
ভুল পথে ঘুরে ঘুরে।
আমার হদিশ জীবনের পথে
মন্ত্র থেকে
ঘুরে গিয়েছে যে কিছু দূর গিয়ে

মুক্তির পথে বেঁকে।
 বন্ধু, কুয়াশা, সাবধান এই
 সূর্যোদয়ের ভোরে;
 পথ হারিও না আলোর আশায়
 তুমি একা ভুল ক'রে।
 বন্ধু, আজকে জানি অঙ্গির
 রক্ত, নদীর জল,
 নীড়ে পাথি আর সমুদ্র চঞ্চল।
 বন্ধু, সময় হয়েছে এখনো
 ঠিকানা অবজ্ঞাত
 বন্ধু, তোমার ভুল হয় কেন এত?
 আর কতদিন দুচক্ষু কচ্ছলাবে,
 জালিয়ানওয়ালায় যে পথের শুরু
 সে পথে আমাকে পাবে,
 জালালাবাদের পথ ধ'রে ভাই
 ধর্মতলার পরে,
 দেখবে ঠিকানা লেখা প্রত্যেক ঘরে
 ক্ষুঁক্ষু এদেশে রক্তের অক্ষরে।
 বন্ধু, আজকে বিদায়!
 দেখেছ উঠল যে হাওয়া ঝোড়ো,
 ঠিকানা রাইল,
 এবার মুক্তি স্বদেশেই দেখা ক'রো।।

ডাক

মুখে-মন্দু-হাসি অহিংস বুদ্ধের
ভূমিকা চাই না। ডাক ওঠে যুদ্ধের।
গুলি বেঁধে বুকে উদ্ধত তবু মাথা—
হাতে হাতে ফেরে দেনা-পাওনার খাতা,
শোনো ছুক্ষার কোটি অবরুদ্ধের।
দুর্ভিক্ষকে তাড়াও, ওদেরও তাড়াও—
সন্ধিপত্র মাড়াও, দু'পায়ে মাড়াও।
তিন-পতাকার মিনতিঃ দেবে না সাড়াও?
অসহ্য জ্বালা কোটি কোটি ক্ররুদ্ধের!

ক্ষতবিক্ষত নতুন সকাল বেলা,
শেষ করব এ রফ্তের হোলিখেলা,
ওঠো সোজা হয়ে, পায়ে পায়ে লাগে ঠেলা
দেখ, ভিড় দেখ স্বাদীনতালুদ্ধের।

ফাল্গুন মাস, ঝরুক জীর্ণ পাতা।
গজাক নতুন পাতারা, তুলুক মাথা,
নতুন দেয়াল দিকে দিকে হোক গাঁথা—
জাগে বিক্ষোভে চারিপাশে ক্ষুদ্ধের।

কুদে তৃষ্ণার জল পাবে কত কাল?
সম্মুখে টানে সমুদ্র উত্তালঃ
তুমি কোন্ দলে? জিজ্ঞাসা উদ্দামঃ
'গুগু'র দলে আজো লেখাও নি নাম?

দুরাশার মৃত্যু

দ্বারে মৃত্যু,
বনে বনে লেগেছে জোয়ার,
পিছনে কি পথ নেই আর?
আমাদের এই পলায়ন
জেনেছে মরণ,
অনুগামী ধূর্ত পিছে পিছে,
প্রস্থানের চেষ্টা হল মিছে।

দাবানল!
ব্যর্থ হল শুষ্ক অশ্রুজল,
বেনামী কৌশল
জেনেছে যে আরণ্যক প্রাণী
তাই শেষে নির্মূল বনানী॥

দেশলাই কাঠি

আমি একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের কাঠি
 এত নগণ্য, হয়তো চোখেও পড়ি নাঃ
 তবু জেনো
 মুখে আমার উসখুস করছে বারুদ–
 বুকে আমার জ্বলে উঠবার দুরন্ত উচ্ছ্বাস;
 আমি একটা দেশলাইয়ের কাঠি।

মনে আছে সেদিন হুলস্থূল বেধেছিল?
 ঘরের কোণে জ্বলে উঠেছিল আগুন–
 আমাকে অবজ্ঞাভরে না-নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলায়!
 কত ঘরকে দিয়েছি পুড়িয়ে,
 কত প্রাসাদকে করেছি ধূলিসাঁ
 আমি একাই- ছোট্ট একটা দেশলাই কাঠি।

এমনি বহু নগর, বহু রাজ্যকে দিতে পারি ছারখার করে
 তবুও অবজ্ঞা করবে আমাদের?
 মনে নেই? এই সেদিন–
 আমরা সবাই জ্বলে উঠেছিলাম একই বাস্ত্রে;
 চমকে উঠেছিলে–
 আমরা শুনেছিলাম তোমাদের বিবর্ণ মুখের আর্তনাদ।

আমাদের কী অসীম শক্তি
 তা তো অনুভব করেছ বারংবার;
 তবু কেন বোঝো না,
 আমরা বন্দী থাকবো না তোমাদের পকেটে পকেটে,
 আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
 শহরে, গঞ্জে, গ্রামে-দিগন্ত থেকে দিগন্তে।
 আমরা বার বার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়–
 তা তো তোমরা জানোই!
 কিন্তু তোমরা তো জানো না:

কবে আমরা জুলে উঠব—
সবাই শেষবারের মতো!

প্রস্তুত

কালো মৃত্যুরা ডেকেছে আজকে স্বয়ম্ভুরায়,
নানাদিকে নানা হাতছানি দেখি বিপুল ধরায়।
ভীত মন খোঁজে সহজ পন্থা, নিষ্ঠুর চোখ;
তাই বিষাক্ত আঙ্গাদময় এ মর্তলোক,
কেবলি এখানে মনের দ্বন্দ্ব আগুন ছড়ায়।

অবশেষে ভুল ভেঙেছে, জোয়ার মনের কোণে,
তীব্র ভূকুটি হেনেছি কুটিল ফুলের বনে;
আভিশাপময় যে সব আত্মা আজো অধীর,
তাদের সকাশে রেখেছি প্রাণের দৃঢ় শিবির;
নিজেকে মুক্ত করেছি আত্মসমর্পণে।

চাঁদের স্বপ্নে ধুয়ে গেছে মন যে-সব দিনে,
তাদের আজকে শত্রু বলেই নিয়েছি চিনে,
হীন স্পর্ধারা ধূর্তের মতো শক্তিশেলে
ছিনিয়ে আমায় নিতে পারে আজো সুযোগ পেলে
তাই সতর্ক হয়েছি মনকে রাখি নি খণে।

অসংখ্য দিন কেটেছে প্রাণের বৃথা রোদনে
নরম সোফায় বিল্লবী মন উদ্বোধনে;
আজকে কিন্তু জনতা-জোয়ারে দোলে প্লাবন,
নিরন্ন মনে রক্তিম পথ অনুধাবন,
করছে পৃথিবী পূর্ব-পন্থা সংশোধনে।

অস্ত্র ধরেছি এখন সমুখে শত্রু চাই,
মহামরণের নিষ্ঠুর ব্রত নিয়েছি তাই;
পৃথিবী জটিল, জটিল মনের সন্তাষণ
তাদের প্রভাবে রাখিনি মনেতে কোনো আসন,
ভুল হবে জানি তাদের আজকে মনে করাই।।

প্রার্থী

হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায়
আমরা থাকি,
যেমন প্রতীক্ষা ক'রে থাকে কৃষকদের চঞ্চল চোখ,
ধানকাটার রেমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।

হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে,
এক-টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!

সকালের এক-টুকরো রোদুর
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।
ঘর ছেড়ে আমরা এদিক ওদিকে যাই
এক-টুকরো রোদুরের তৃষ্ণায়।

হে সূর্য!
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও,
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

হে সূর্য
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও
শুনেছি, তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকেই এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হব!
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,

তখন হয়তো গরম কাপড়ে টেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ত্রি উলঙ্ঘ ছেলেটাকে।
আজ কিন্তু আমরা তোমার অকৃপণ উত্তাপের প্রার্থী॥

ফসলের ডাক ১৩৫১

কান্তে দাও আমার এ হাতে
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে ।
শক্তির উন্মুক্ত হাওয়া আমার পেশীতে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি চেতনার বিদ্যুৎ বিকাশ :
দু পায়ে অস্থির আজ বলিষ্ঠ কদম ;
কান্তে দাও আমার এ হাতে ।

দু চোখে আমার আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন,
নি-শব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেতে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার
মৌসুমি হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক ;
শহরের চুল্লী ঘিরে পতঙ্গের কানে ।

বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে,
মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ,
কান্তে দাও আমার এ হাতে ।
মনে আছে একদিন তোমাদের ঘরে
নবান্ন উজাড় ক'রে পাঠিয়েছি সোনার বছরে,
নির্ভাবনার হাসি ছড়িয়েছি মুখে
তৃপ্তির প্রগাঢ় চিহ্ন এনেছি সম্মুখে,
সেদিনের অলক্ষ্য সেবার বিনিময়ে
আজ শুধু কান্তে দাও আমার এ হাতে ।

আমার পুরনো কান্তে পুড়েন গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্তি কান্তে চৈতন্যপ্রখর ——
যে কান্তে ঝল্ল সাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে...

জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে,
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাস্তারে ;
তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
শুধু আজ কান্তে দাও আমার এ হাতে ।

পরাণ্ত অনেক চাষী ; ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ——
জলন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষের আত্মসমর্পণ,
তাদের ফসল প'ড়ে দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসন্ধানী
তাদের ক্ষেত্রের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি——
আমাকেই কাস্তে নিতে হবে।
নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার ঘন্টণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীর্ণ সংকেত ;
তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে ॥